সংকলনেঃ

মিঠু কুমার রায়, সহঃ শিক্ষক,

তুলারামপুর সরঃপ্রাথঃবিদ্যালয়

নড়াইল সদর, নড়াইল।

**১১ শিবমন্দির যশোর জেলার এক ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন**

যশোর জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা অভয়নগর। বাংলাদেশের আর পাঁচটি গ্রামের মতোই সাধারণ একটি গ্রাম এই অভয়নগর। যশোর সদর উপজেলা থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে অভয়নগর উপজেলার বাঘুটিয়া ইউনিয়নে ভৈরব নদীর তীরে অবস্থিত গ্রামটি। এই গ্রামের মনোরম পরিবেশে অবস্থিত অনিন্দ্যসুন্দর ১১ টি শিব মন্দির; এক প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা। এই সাদামাটা গ্রামটিতে এমন দৃষ্টিনন্দন একগুচ্ছ মন্দির নির্মানের অন্তরালে লুকিয়ে আছে ভাগ্যাহত এক দুখিনী রাজকন্যার জীবন কাহিনী। সেই ইংরেজ আমলে কীভাবে এই ঐতিহাসিক স্থাপনাটি নির্মিত হয়েছিলো, তা জানতে হলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে প্রায় তিনশ’ বছর পূর্বে।

মুঘলদের সাথে যুদ্ধে প্রতাপশালী যশোর রাজ্যের রাজা প্রতাপাদিত্য পরাজিত ও বন্দী হন। ফলে রাজপরিবারের সদস্যরা এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েন ভাগ্যান্বেষণে। তাদের একজন ঠাই নিয়েছিলেন যশোরের চাচড়া অঞ্চলে। এদের উত্তরপুরুষ রাজা নীলকণ্ঠ রায়। পরিশ্রম করে নিজের ভাগ্য ফিরিয়েছিলেন। ধন-দৌলত আর শক্তি-সামর্থে সবার সমীহ আদায় করে নিয়েছিলেন তিনি।

এই নীলকণ্ঠ রায়ের ঘর আলো করে জন্মগ্রহণ করেছিলো এক কন্যাসন্তান। পিতা কন্যার নাম রাখলেন অভয়া। তখন বাংলায় চলছে এক ক্রান্তিকাল। এ অঞ্চলে জালের মতো বিস্তৃত শত শত নদ-নদী আর খাল-বিল। আরো দক্ষিণে এগিয়ে গেলে দুর্ভেদ্য সুন্দরবন। এই সুযোগ নিয়ে দুর্ধর্ষ হার্মাদ জলদস্যুরা এই এলাকার মানুষের উপর চালাতো পাশবিক নির্যাতন। ধনসম্পদ লুটের পাশাপাশি নারী ও শিশুদের ধরে নিয়ে দাস হিসেবে বিক্রি করে দিতো। তাদের দমন করার জন্য রাজা নীলকণ্ঠ রায় উদ্যোগ নিলেন। ভৈরব নদের তীরে হিন্দুদের একটি অতি প্রাচীন তীর্থস্থান ভাটপাড়া। ভাটপাড়ার পাশেই নদীর তীরে তিনি দুর্গ নির্মাণ করেন। তারপর রাজধানী চাচড়া থেকে এখানে সপরিবারে স্থানান্তরিত হলেন।

এখানেই বেড়ে উঠতে লাগলেন রাজকন্যা অভয়া। প্রাপ্তবয়স্কা হলে অভয়ার বিয়ে ঠিক করা হয় সে সময়ের অত্যন্ত প্রভাবশালী জমিদার ‘নড়াইল জমিদার’ বংশের একজন নীলাম্বর রায়ের সাথে।অদৃষ্টের পরিহাসে বিয়ের অল্প কিছুদিন পরে নীলাম্বর রায় দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। কিছুদিন রোগভোগের পরে মারা যান নীলাম্বর রায়। বিধবা হন রাজকন্যা অভয়া। তিনি ছিলেন শৈব অর্থাৎ মহাদেব শিবের উপাসক। পিতার কাছে অনুরোধ করলেন, তিনি তার বাকি জীবন মহাদেবের আরাধনা করেই কাটিয়ে দিতে চান।

নীলকন্ঠ রায় মেয়ের ইচ্ছা শুনে রাজবাড়ির সন্নিকটে মেয়ের জন্য মন্দির নির্মাণ করে দেন। একটি-দুটি নয়, ৬০ একর জায়গার উপর ১১টি শিব মন্দির নির্মাণ করেন তিনি। আর মেয়ের নাম অনুসারে নগরের নাম রাখেন অভয়ানগর, যা কালক্রমে পরিচয় পেয়েছে অভয়নগর নামে। ভৈরব নদের তীরে এখনো দাঁড়িয়ে আছে সেই স্থাপনা। এটি শুধুমাত্র একটি সুন্দর মন্দিরই নয়, একই স্থানে এতগুলো শিব মন্দির বাংলাদেশে আর কোথাও নেই।

মন্দিরের নির্মাণকাল ১৭৪৫-৬৪ সাল। মন্দির নির্মাণে ব্রিটিশ আমলে অনুসৃত চুন সুরকি এবং ইটের ব্যবহার করা হয়েছে। ইটের আকৃতি পাতলা ও বর্গাকার। চুন-সুরকির প্রলেপ ধরে রেখেছে ইটগুলোকে। ১১টি মন্দিরের মধ্যে সর্ব উত্তরের মন্দিরটি মূল মন্দির। মূল মন্দিরটির দৈর্ঘ্য ২৪ ফুট ৪ ইঞ্চি ও প্রস্থ ২২ ফুট ৩ ইঞ্চি। দেয়ালের প্রস্ত ৩ ফুট ৪ ইঞ্চি। প্রধান মন্দিরের দুই পাশে পূর্ব ও পশ্চিমে ৪টি করে মোট ৮টি ও প্রবেশপথের দুই দিকে ২টিসহ মোট ১০টি অপ্রধান মন্দির রয়েছে। ১১টি মন্দিরে রয়েছে ১১টি কষ্টিপাথরের শিবলিঙ্গ ছিল যা চুরি হয়ে যায়। মন্দিরের বাইরে দক্ষিণ দিকে আছে একটি প্রধান প্রবেশপথ। প্রতিটি মন্দিরে প্রবেশের জন্য আছে খিলানাকৃতির দরজা ও দেয়ালে পোড়ামাটির ফলক ও অনিন্দ্যসুন্দর কারুকাজ। তার মধ্যে রয়েছে পদ্মসহ আরো অনেক চিত্রের মোটিফ।

মন্দিরের বিশেষত্ব এটি স্থানীয় রীতিতে নির্মিত। সে সময়ে যে বাংলায় উন্নত মানের স্থাপত্যশিল্প বর্তমান ছিলো এটি তার প্রমাণ বহন করে চলেছে। ছাঁদগুলো নির্মিত হয়েছে উলম্ব ধরনের ডোমের সমন্বয়ে। অর্থাৎ দুই স্তরে নির্মিত ছাদের ভেতরে গোলাকার এবং বাইরে চালা রীতিতে নির্মিত। সবগুলো মন্দির নির্মাণে স্থানীয় উপকরণ, নির্মাণশৈলি এবং দক্ষতার ছাপ মেলে।

মন্দিরের চারপাশে একসময় প্রাচীর বেষ্টিত ছিলো। এখনও তার চিহ্ন রয়েছে। উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি পুকুর ছিলো। এখন সেটি দখলদারদের কবলে। আর রাজবাড়ি? সেখানে এখন পানের বরজ!

মন্দিরগুলো জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে ছিলো বহুবছর।২০১৪ সালে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর প্রথম ধাপের সংস্কার কাজ আরম্ভ করে, যা শেষ হয় ২০১৭ সালে। এই সংস্কারের ফলে দৃষ্টিনন্দন এই স্থাপনা ধ্বংসের হাত থেকে আপাতত রেহাই পেয়েছে।অনিন্দ্যসুন্দর এই স্থাপনা আর পাশের স্বচ্ছসলিলা ভৈরব নদ পর্যটনের একটি চমৎকার আকর্ষন হতে পারে।

তথ্যসূত্রঃ

* ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র রচিত প্রামাণ্যগ্রন্থ  ‘যশোহর খুলনার ইতিহাস;
* উইকিপিডিয়া